গানের রবীন্দ্রনাথ

- ডঃ অনিতা চৌধুরী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে। আগামী বছরে তাঁর সার্ধশতবার্ষিক জন্ম জয়ন্তীতে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার বাল্যবয়সে স্কুলে, পাড়ার ক্লাবে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির কবিতা আবৃত্তি করে, নাচে, গানে, নৃত্যনাট্যে কবির রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটল। পরে গরমের ছুটির দীর্ঘ অবসরে বাড়ীতে বাবার ও দাদার নিজস্ব লাইব্রেরীতে কবির ও অন্যান্যদের লেখা পড়ে তাঁর অন্য অন্য রূপের পরিচিতি বিস্মিত করল। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলি পড়ে মনে হল, তিনি শুধু গল্প লিখে গেলেই পারতেন। দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি , গীতিকার, নাট্যকার, ছোটগল্প লেখক নন, তিনি ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকারও ; আর কত রকমের প্রবন্ধ -- সাহিত্যচিন্তা, স্বদেশভাবনা, ধর্মচিন্তা, শিক্ষাভাবনা, বিশ্বহিত ও শান্তি, দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষ, সমবায় প্রথা, হস্তশিল্প ইত্যাদি। কি চমৎকার পত্রলিখন – "ছিন্নপত্র" তুলনাহীন, দেশ-বিদেশের ভ্রমণ কাহিনীতে কত বিশ্লেষণ। তাঁর এই নানা দিকে প্রতিভার বিচ্ছুরণ যেন এক পলকাটা হীরের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু সবথেকে যা বেশী মুগ্ধ ও আপ্লুত করে তা তাঁর অতুলনীয় গান -- রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর হৃদয়ের গভীরে ছুঁয়ে যায় পূজা পর্যায়ের গানগুলি।

ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশে সঙ্গীতচর্চা ছিল। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার পণ্ডিত যদুভট্ট তাঁর গুরু ছিলেন। সেখানে শেখা "ধ্রুপদ" গানের ভিত্তিতে পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন নতুন গান রচনা করেছেন অনেক নমনীয়ভাবে। খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পারও ব্যবহার করেছেন গানে। পাঞ্জাবী টপ্পা ও নিধুবাবুর টপ্পার ধাঁচেও গান লিখেছেন। "কে বসিলে হৃদয়াসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু" পাঞ্জাবী টপ্পার মতো হলেও তাতে নিজস্বতা ও নমনীয়তা লক্ষ্যনীয়।

বার বছর বয়সে, হিমালয়ের নির্জনে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে কেটেছে তাঁর বাল্যকালের কিছু সময়। ধ্যান, সঙ্গীত, উপনিষদ নিত্যসঙ্গী ছিল সেখানে -- উত্তরকালের "ব্রহ্মসঙ্গীত" তারই ফসল।

সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার সুর ও ভাব তাঁর সঙ্গীতে স্বকীয়তায় হাজির হয়েছে। ভজনের সুর, পাঞ্জাবী, তমিল, কন্নড়, গুজরাটি গানের সুর ও সকল কিছু নিয়ে নতুনভাবে গান তৈরী হয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় "ভাঙ্গা গান" -- যেমন , "বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী " (তামিল)।

বিদেশী গানের সুর নিয়ে খুব অল্পবয়সেই গান রচনা করেন। স্কটিশ গানের সুরে "পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়", "ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে, বহে কিবা মৃদু বায়"। ১৮৭৯ - ৮০তে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান আইন পড়তে। সেই সময় শোনা ওখানকার নানা গানের সুর বা তার ছায়া পড়েছে ফিরে এসে "বাল্মিকী প্রতিভা", "কালমৃগয়া" ইত্যাদি নাটকের গানে ও অন্যান্য অনেক গানেও।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর শিলাইদহ এস্টেটের দেখাশোনার দায়িত্ব পান পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ওখানে থাকার সময় খুব নিকট থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষকের সংস্পর্শে এসেছেন। তখন তাঁদের সুখ-দুঃখ যেমন জেনেছেন, তেমনি মাটির কাছাকাছি লোকসঙ্গীতের সুরও তার মন ভরিয়ে দিয়েছে। শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে গগন হরকরা, ফকির ফিকিরচাঁদ ও সুনাউল্লা বাউল এসে গান শুনিয়ে যেত কবিকে। শান্তিনিকেতনে নবনীদাস বাউলের গানও কবিকে আনন্দ দিত। লালন ফকিরের গানও শুনেছেন পদ্মার ধারের মানুষের কাছে। এছাড়া ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারিগান -- এগুলিও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন অসংখ্য স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন এই সব সুর নিয়ে এবং জনসাধারণের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে যায় তার উন্মাদনা। "আপনজনে ছাড়বে তোরে", "তা বলে ভাবনা করা চলবে না", "ও আমার সোনার বাংলা , আমি তোমায় ভালবাসি" ইত্যাদি।

"তাল" নিয়েও কবি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও তিন চার রকমের নতুন তাল তৈরী করেছেন।

সারা জীবন ধরে বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ -- সেগুলিকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে , যেমন ১) পূজা (ব্রহ্মসঙ্গীত সহ) ২) প্রকৃতি ৩) প্রেম ৪) স্বদেশ ৫) নাট্যগীতি ৬) কাব্যগীতি ৭) কীর্ত্তনাঙ্গ ৮) বিবিধ ৯) রাগাশ্রয়ী গান।

তবে একেবারে পরিস্কার ভাগ করা সম্ভব নয় -- অনেক সময় পূজার গান ও প্রেম পর্যায়ের গানের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। কবি ঈশ্বরকে কখনও বলেছেন "জীবন-দেবতা", "পরাণ-বধূ", কখনও অচিন পাখির মতো, কখনও রহস্যাবৃত ঘোমটা পরা নারী, কখনও বা দারুণ দীপ্ত পুরুষ। সমস্ত ধর্মের নির্য্যাস নিয়ে নিজের মতো করে এক আড়ম্বরহীন নিবিড় আনন্দময় ঈশ্বরপ্রেম জন্ম নিয়েছে তাঁর মাঝে -- পূজার গানে গানে তারই প্রকাশ। যেমন, "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি"।

সমস্ত মানবজাতি এক অহিংস, শান্তিপূর্ণ সৌভ্রাত্রসূত্রে গাঁথা পড়ুক এও আছে গানে -- শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর ভিত্তিও তাই – "যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্"।

"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে" ব্রহ্মসঙ্গীত পূজা পর্যায়েই স্থান পায়। প্রকৃতি পর্যায়ে কবি সব ঋতু নিয়েই গান লিখেছেন – "নাই রস নাই, দারুণ দহনবেলা" (গ্রীষ্ম), "আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে" (শরৎ), "হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে"

(হেমন্ত), "এলো যে শীতের বেলা" (শীত), "বসন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল" (বসন্ত) । কিন্তু সব থেকে বেশী গান লিখেছেন কবি বর্ষার --তাঁর প্রিয় ঋতুর – "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে" কিম্বা "আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে" ।

প্রেম পর্যায়েও বহু গান রয়েছে বর্ষার গানের মতোই প্রাণ ভরিয়ে দেবার, যেমন -- এই "উদাসী হাওয়ার পথে পথে" , "সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া" । স্বদেশ পর্যায়ের উদ্দীপনার গান – "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" , "ও আমার দেশের মাটি" , "আমার সোনার বাংলা" আজ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" কবির রচনা ।

নাট্যগীতির গানগুলিও আলাদাভাবে জনপ্রিয় । "ন্যায়অন্যায় জানি নে, জানি নে" (শ্যামা), "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (রাজা)" । কাব্যগীতির বেশীরভাগ গান সুগীত ও সকলের পছন্দের "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" , "প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসে" , "খাঁচার পাখি ছিল" ইত্যাদি ।

কবি কীর্তনাঙ্গ গানগুলি রচনা করেন কীর্ত্তন গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। অনেক গানে দোহার পর্যন্ত রেখেছেন – "ভালবেসে, সখী, নিভৃত যতনে" , "সখী, বহে গেল বেলা" ।

এছাড়া বহু গান রয়েছে নানা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে । যেমন – "সদা থাকো আনন্দে" (বিয়ে উপলক্ষ্যে) , "হে নূতন, দেখা দিক আর-বার" (জন্মদিন), "তপের তাপের বাঁধন কাটুক" (বর্ষামঙ্গল), বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি । বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী গানকেও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ফেলেছেন । যেমন, "যতবার আলো জ্বালাতে চাই" (রাগ কামোদ), "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" (রাগ কাফি)।

প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীত শান্তিনিকেতন, ব্রাহ্ম সমাজ ও কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন, বিশেষতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন, কংগ্রেসমেলার সময় থেকেই সাধারণ্যে বরণীয় হল রবীন্দ্রসঙ্গীত । সুগায়ক পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করে আরও বাড়িয়ে দিলেন তার জনপ্রিয়তা ।

অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে, প্রকৃত সুর আরোপে, ভাষা ও ভাবের লীলায় সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ঋদ্ধ । সেইসব বজায় রেখে গানের সুরে, কথায় ও ভাবে সকলকে ভাসিয়ে দিতে সুগায়ক ও গায়িকাদের অবদানও কম নয় -- শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, সুবিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, ঋতু গুহ, পূর্বা দাম, বনানী সেনগুপ্ত, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, রমা মণ্ডল, প্রমিতা মল্লিক, মোহন সিং, অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, আশীষ ভট্টাচার্য্য, রণ গুহঠাকুরতা ও আরও অনেকেই সেই ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন । ওপার বাংলায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা প্রবল জোয়ারে চলেছে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার চাহিদা বাড়ছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকারা নিয়মিত নিমন্ত্রণ পান সেখানে । "আজি হতে শতবর্ষ পরে"-তে কবির মনে অনিশ্চয়তা ছিল ও আকুলতা ছিল "তবু মনে রেখো"-তে ।

কিন্তু হে কবি, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, আনন্দে-মিলনে-বিরহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালেই প্লাবিত হয়ে চলেছি সার্ধশতবর্ষ ধরে । ❑